চোল শাসন ব্যবস্থা ও স্বায়ত্ত্ব শাসন নীতি (The Chola administration and the system of local self Government) ঃ চোল শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, রাষ্ট্র বা রাজা এবং কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

রাজার ক্ষমতা

দুইয়ের মাঝে কোন মধ্যস্বত্বভোগী সামন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করত না। রাজা বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করতেন। সাধারণতঃ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতো। অনেক সময় রাজা জীবিতকালেই যুবরাজকে শাসন ব্যবস্থার

দায়িত্ব দিতেন। এর ফলে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ খুবই কম ছিল। চোল রাজারা আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি পছন্দ করতেন। "চোল মার্ত্তন্ড", "গঙ্গাইকোন্ড" ইত্যাদি উপাধি তাঁরা নিতেন। মৃত রাজার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পুজো করে চোল রাজারা ঐশ্বরিক অধিকার দাবী করতেন। অনেক সময় মৃত রাজার স্মরণে মন্দির তৈরি করা হতো। রাজা সাধারণতঃ মৌখিক আদেশ দ্বারা রাজকার্য চালাতেন। মন্ত্রী ও অমাত্যরা তাঁকে পরামর্শ দিত। রাজগুরু ছিলেন রাজার খুবই বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। রাজার প্রাসাদ, অসংখ্য কর্মচারী ও রাজসভা সকল কিছু ছিল দারুণ আড়ম্বরপূর্ণ। রাজরাজ ও তাঁর বংশধরেরা পাথরের ওপর খোদাই করা লিপিতে রাজত্বের প্রধান ঘটনাগুলির কথা লিখে রাখতেন। রাজ্যের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরমে রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজার ছিল বহু দেহরক্ষী ও অসংখ্য ভৃত্য। রাজা ঘেটিকা, অগ্রহার, মন্দির, বিহার, জলসেচ ব্যবস্থার জন্যে মুক্ত হস্তে দান করতেন। রাজার প্রতি সেনাদল ও নৌবাহিনী ব্যক্তিগত আনুগত্য জানাত। সেনাদল যুদ্ধে যা লুঠ করত তার বৃহৎ অংশ রাজাকে দিত। রাজা যে সকল মৌখিক আদেশ দিতেন সচিব ও অমাত্যরা তা লিখে নিত। রাজার আদেশ সঙ্কলন করে কর্মচারীর সহি সহ মন্দির বা প্রকাশ্য স্থানে তা টাঙিয়ে দেওয়া হতো।

চোল শাসন ব্যবস্থায় একটি সুগঠিত আমলাতন্ত্রের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করা হতো। চোল সরকারের কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা স্থানীয় কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু তাঁরা স্থানীয় উদ্যোগকে খর্ব করতেন না। কর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুসারে সামাজিক মর্যাদা ছিল। যোগ্যতা ছিল কর্মচারীদের উন্নতির মাপকাঠি। কর্মচারীরা নগদ টাকায় বেতন পেতেন না, জমির দ্বারা তাঁদের প্রাপ্য দেওয়া হতো। জমির মালিকানা কর্মচারীদের দেওয়া হতো না। রাজস্ব আদায়ের জন্যে কয়েকটি স্বত্ব দেওয়া হতো। রাজা মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চল পরিক্রমা করে প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন। চোল শাসন পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন বর্গের কর্মচারীর সাহায্য নেওয়া হতো। উচ্চ কর্মচারীরা নিজেদের একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করে। এই সকল পদ বংশানুক্রমিক সূত্রে ভোগ করা হতো এবং বেতনের বদলে জমি দ্বারা পারিশ্রমিক দেওয়া হতো।

শাসন বিভাগ

চোল সাম্রাজ্যকে শাসনের সুবিধার জন্যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হতো। প্রদেশগুলির নাম ছিল মন্ডলম। 'মন্ডলম' বা প্রদেশগুলিকে 'কোট্টাম' বা জেলায় ভাগ করা হতো। কোট্টামগুলিকে 'নাড়ু' বা অঞ্চলে ভাগ করা হতো। নাড়ুর অধীনে ছিল 'কুর্‌রম' এবং কিছু সংখ্যক গ্রাম নিয়ে 'কুর্‌রম' গঠিত হতো। বড় গ্রামকে তনিয়ুর বলা হতো। মন্ডলমের শাসনকর্তা ছিল প্রাদেশিক শাসক। রাজার বিশ্বাসভাজন লোকেরা এই পদ পেত। রাজার সঙ্গে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে এই শাসনকর্তা বেশ যোগ রেখে চলত। এই কর্মচারীর অধীনে আরও বহু কর্মচারী কাজ করত।

রাজস্ব ব্যবস্থা

ভূমি রাজস্ব থেকে চোল সরকারের প্রধান আয় হতো। ভূমি কর নগদ অর্থে অথবা ফসলের ভাগে আদায় হতো। জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তির অথবা গ্রাম সম্প্রদায়ের। গ্রামের রাজস্ব আদায় দিতে গ্রামসভা দায়ী থাকত। ভূমি রাজস্বের হার ছিল সম্ভবতঃ ফসলের $^{১}/_{৩}$ ভাগ অথবা এই ফসলের ভাগের মূল্য। জমির উর্বরতার তারতম্য অনুসারে করের বেশী কম হতো। বন্যা প্রতিরোধ, বাঁধ তৈরির জন্যে বাড়তি কর ধার্য হত। প্রতি গ্রামে কিছু নিস্কর জমি থাকত যা সর্বসাধারণের কাজে লাগত। তবে সামন্তরা কেন্দ্রীয় আইন অগ্রাহ্য করে বেশী কর আদায় করত। বিশেষতঃ চোল সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে এই ঘটনা ঘটতে থাকে। বাকি কর কঠোরভাবে জমি বা সম্পত্তি ক্রোক করে আদায় করা হতো। মাঝে মাঝে জমি জরিপ করে ভূমি রাজস্ব ধার্য করা হতো। জমিকে আবাদযোগ্য ও করযোগ্য এবং অনাবাদী এই দু ভাগে ভাগ করা হতো। ভূমি রাজস্ব ছাড়া চোল রাজারা শুল্ক,

বাণিজ্য শুল্ক, লবণ শুল্ক প্রভৃতি আদায় করতেন। কর আদায় ব্যবস্থায় খুব কড়াকড়ি ছিল।

চোল রাজারা গ্রামের বিচার ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা চালাতেন। ধর্মীয় শপথ দ্বারা বিচার অথবা সাক্ষী ও আইনের দ্বারা উভয় প্রকারে বিচার হতো। রাজকীয় আদালতের নাম ছিল ধর্মাসন। আইন জানা ব্রাহ্মণরা ধর্মাসনে বিচার করতেন। তার ওপরে নাড়ুর শাসকের কাছে আপীল করা যেত। রাজা নিজে রাজদ্রোহের বিচার করতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার একই আদালতে হতো। রাজ্যে গরু চুরির প্রাদুর্ভাব ছিল। এজন্যে বহু মামলা হতো। জরিমানা, কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হতো। এছাড়া হাতির পায়ের তলায় পিষে অথবা বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দেওয়া হতো। রাষ্ট্রের রাজস্বের কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হতো। সেচ বাঁধ তৈরি, সেচ খাল, সেচ হ্রদ খোদাই করে রাজস্ব ব্যয় করা হতো। এছাড়া দেব মন্দির নির্মাণ ও নগর স্থাপনায় রাজস্ব ব্যয় করা হতো।

বিচার ব্যবস্থা

চোল সেনাদল স্থল ও নৌবাহিনী এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। স্থল সেনারা ধানুকী, জঙ্গলের লড়াইয়ে দক্ষ সেনা, অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। চোল রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। শত্রুর দেশের সাধারণ নাগরিকের ঘরবাড়ি লুঠ, নারী হরণ, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ছিল চোল যুদ্ধনীতির অঙ্গ। সেনাবাহিনী অসামরিক কাজে, দান-ধ্যান প্রভৃতিতেও অংশ নিত। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু শিবির থেকে যে সম্পদ লুঠ করা হতো তার অনেকটা দান-ধ্যানে ব্যয় করা হতো।

সামরিক সংগঠন

চোল রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামে তখনকার যুগে এক অসাধারণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা পরামর্শদাতা বা দর্শক হিসেবেই থাকত। তারা গ্রামের স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে হাত দিত না। চোল গ্রামীণ শাসন এতই স্বাধীন ছিল যে, রাজধানীতে রাজার পরিবর্তন হলেও গ্রামশাসন তার নিজ নিয়মে চলত। উপরতলার ওঠা-পড়ার প্রভাব তাকে স্পর্শ করত না। গ্রামসভাগুলিই প্রধানতঃ গ্রামের শাসন চালাত। গ্রামের শাসনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের সভা ছিল। গ্রামগুলিকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হতো এবং প্রতি এলাকায় স্থানীয় সভা ছিল। এই সভায় বিভিন্ন বৃত্তির লোকেদের প্রতিনিধি থাকত। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রাম সভা সমন্বয় স্থাপন করত। গ্রামে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল এবং প্রতি গোষ্ঠীর বিশেষ ধরনের কাজের দায়িত্ব ছিল। গোষ্ঠীগুলি সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত হত। গোষ্ঠীগুলি যে বিষয়ে দায়িত্ব বহন করত সেই কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনার জন্যে প্রতি গোষ্ঠীর সমিতি থাকত। গোষ্ঠী বিফল হলে সমিতি হস্তক্ষেপ করত। গ্রামের সাধারণ সভায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা যোগ দিতে পারত।

চোল স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা

সাধারণ সভা তিন প্রকারের ছিল, যথা—(১) কর দাতা গ্রামবাসীদের সভার নাম ছিল উর; (২) ব্রাহ্মণদের সভার নাম ছিল সভা; (৩) আধা শহর অঞ্চলের বণিকদের সভার নাম ছিল 'নগরম'। বড় গ্রামগুলিতে একাধিক করদাতাদের সভা বা 'উর' থাকত।

গ্রাম সভা

গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল উরের সদস্য। তবে বর্ষীয়ানরাই সভার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। উর বা সাধারণ সভাগুলির সদস্য সংখ্যা কত হত তা জানা যায় নি। তারা নির্বাচিত হত অথবা গ্রামবাসী হিসেবে যোগ দিত অথবা পরিবারের কর্তারাই যোগ দিত তাও জানা যায়নি। তবে গ্রামের প্রতি কুড়ুম্বু বা পাড়া থেকে প্রতিনিধি দ্বারা উর গঠিত হত। কখনও কখনও একটি গ্রামে দুটি উর থাকত। প্রতি উরে একটি শাসন পরিচালনা বিভাগ থাকত। গ্রামের মাথা-পিছু খাজনা ধার্য, আদায়, বাঁধ তৈরি, খাল খননের

উর

সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রাম সভা বা উরে নেওয়া হত। গ্রামের লোকেদের বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি উরে করা হত।

সভা ছিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ গ্রামগুলির সংগঠন। চোল যুগে অগ্রহার, ঘেটিকা স্থাপন, মন্দির স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপকভাবে করা হত। ফলে রাজারা ব্রাহ্মণদের ব্যাপক ভূমিদান করতেন এবং বহু গ্রামে ব্রাহ্মণের বসবাস বাড়ে। ব্রাহ্মণরা তাদের গ্রামসভাকে সভা নাম দেয়। অনেক গ্রামে উর ও সভা পাশাপাশি কাজ করত। গ্রামের আদি বাসিন্দা বা অব্রাহ্মণরা উরে যোগ দিত ও ব্রাহ্মণেরা সভায় যোগ দিত।

উর বা সভা বা নগরম তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব সরকারের বিনা হস্তক্ষেপে পালন করত। কিন্তু যদি তারা তাদের সংবিধান পরিবর্তন করত অথবা ভূমি স্বত্বের নিয়ম বদলাত তাহলে রাজকীয় অনুমোদনের দরকার হত। এজন্য কেন্দ্রের দায়িত্বশীল কর্মচারীকে সভায় হাজির হতে হত।

সভা অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ সভা বিভিন্ন সমিতি বা উর ও ব্রাহ্মণ সভা নিয়ে গঠিত ছিল। এ সম্পর্কে চিঙ্গেলপুট ও উত্তরমেরু লিপি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ৯১৯ ও ৯২১ খ্রীঃ যথাক্রমে এই দুই লিপি প্রথম পরান্তক খোদাই করেন। এর মধ্যে উত্তর মেরু লিপিই তথ্যবহুল।

উত্তর মেরু লিপি থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন কুড়ুম্ব বা পাড়া থেকে সমিতি গঠনের জন্যে যোগ্য লোকদের মনোনীত করা হত। যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল বেশ উঁচু, যথা, নিজের বাড়ি, ৩৫-৭০ বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, কিছু জমির মালিকানা প্রভৃতি না থাকলে নির্বাচিত হওয়া যেত না। নৈতিক চরিত্র নির্মল না হলে, সমিতির টাকা-কড়ি আগে তছরূপ না করলে, পরদ্রব্য অপহরণের অপবাদ না থাকলে তবে প্রার্থী হিসেবে যোগ্য মনে করা হত। প্রতি পাড়া থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের একজনকে ভাগ্য পরীক্ষার দ্বারা বেছে নেওয়া হত। তারপর এই সদস্যের দ্বারা উদ্যান সমিতি, পুষ্করিণী সমিতি, স্বর্ণ সমিতি প্রভৃতি গড়া হত।

এই সভা বা মহা সভা গ্রাম সম্প্রদায় ও ব্যক্তির জমির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারত। এই সভা গ্রামবাসীদের প্রদেয় রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ে সাহায্য করত। অন্য কোন কাজের জন্যে আলাদা কর এই সভা স্থাপন করত। জলসেচ ও পথঘাট রক্ষার দায়িত্ব ছিল এই সভার। রাজস্ব আদায় করে সরকারের কাছে এই সভা জমা দিত।

নগরম ছিল আধা গ্রাম, আধা শহরের বণিক সভা। কাজের দিক থেকে উর বা সভার মতই নগরম্ দায়িত্ব বইত। কেহ কেহ বলেন যে, নগরম ছিল বণিকদের নিগম বা গিল্ড। এই নিগমগুলি উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য কিনে তা অন্যত্র বণ্টন করত। এই নিগমগুলি লোকের টাকা-কড়ি জমা রাখত এবং আধুনিক ব্যাঙ্কের মত সেই টাকা চড়া সুদে বণিকদের ঋণ দিত। রাজা ও কর্মচারীরাও তাঁদের সঞ্চিত অর্থ এই নিগমে জমা রাখতেন।

নাড়ুগুলিতেও একটি করে সভা ছিল। তার নাম ছিল "নাওার"। ভূমি-রাজস্ব সংগঠন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় এই সভাগুলি ভূমিকা নিত। নাওার কিভাবে গঠিত হত তা সঠিক জানা যায়নি। নাওার বা সভা বা উরগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হত কিনা তা জানা যায়নি। তবে সাধারণ আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। গ্রাম সভায় মধ্যস্থ ও করণত্তার নামে দুই ধরণের কর্মচারী হাজির থাকত। শেষোক্ত কর্মচারী ছিল হিসাব পরীক্ষক। প্রথম জন নিরপেক্ষভাবে বিবাদ ও ঝগড়ার মীমাংসা করত, জমির সীমা সঠিক রক্ষা এবং ন্যায় নীতি অনুসারে যাতে কাজ কর্ম হয় সেজন্যে সাহায্য করত।